পোনুর চিঠি

বহু বছর আগে যখন আমি একটি সাহিত্য পত্রিকার সঙ্গে যুক্ত ছিলাম তখন এই অকালপক্ক ছোকরা আমাকে পত্রাঘাত করতে শুরু করে। তারপর সেই সাহিত্য পত্রিকা উঠে গেল, পোনুও অদৃশ্য। হঠাৎ কদিন আগে আবার এসে উদয় হয়েছে। পৃথিবী সম্পর্কে ওর নাকি দরকারি অদরকারি অনেক বক্তব্য আছে, আর আমাদের সেটি সাইটে তুলতে হবে। আমি বোঝাবার চেষ্টা করলাম যে, 'অবসর' তথ্য ও বিনোদনের জন্য – আজেবাজে জিনিসে আমরা এটাকে ভরাতে পারি না। পোনু চটে বলল, কেন আমার লেখায় কি তথ্য নেই? আর আপনিইতো আমার লেখা পড়ে হাসেন – সেটা কি বিনোদন নয়? এর পর যদি তথ্য কি আর বিনোদন কি – এই নিয়ে ওর সঙ্গে যদি তর্কে নামতে হয়, তাহলে অবসর–এর কাজ মাথায় উঠবে। এইসব ভেবেই ওর চিঠি ছাপতে রাজি হলাম। পোনু কথা দিয়েছে – শুরু করবে হালকা ভাবে, তারপর নাকি নানান ভারি ভারি বিষয় এনে আমাদের তাক লাগিয়ে দেবে। দেখা যাক!

প্রসঙ্গত, বিভূতিভূষণ মুখোপাধ্যায় (বভম) মশায়ের এক মানসপুত্র ছিল পোনু নামে এমনই এক অকালপক্ক বালক। সে ভগবানকে প্রাণঘাতী সব চিঠি লিখতো, বিভূতিভূষণ পরে 'পোনুর চিঠি' নাম দিয়ে সেসব ছাপিয়েছিলেন। এ ছোকরার সঙ্গে বিভূতিভূষণের কোনো সম্পর্ক নেই এবিষয়ে আমরা নিঃসন্দেহ, কিন্তু তাঁর নাম ভাঁড়িয়ে যে খাচ্ছেনা সেটা হলফ করে বলতে পারিনা। বুঝ সাধু যে জান সন্ধান! -- (abasar.net ওয়েবসাইটে প্রকাশ। এটি তারই সম্পাদকের বিবৃতি ।)

পোনুর চিঠি – ৪

বিষয়: পোনুর গ্রীসদর্শন

এই যে অবসরপ্রাপ্ত স্যার :

রিটায়ার করার পর বেশ তো সময় কাটাচ্ছিলেন মশায় ধাঁধার উত্তর লিখে আর বৌদির তাঁবেদারি করে। কে বলেছিল অবসরের খাল কেটে ভারতকোষের কুমির আনতে? আমরা তো বারণই করেছিলাম বলে মনে পড়ছে। রামায়ণ–মহাভারত করুন, লোকে টিভিতে এবং ভিসিআরে দেখে হদ্দ হয়ে গেছে, আইন–কানুন, নারী–নির্যাতন, কৌতুকী (অবশ্য আপনাদের কৌতুকী এত নিরামিষ যে তা পড়ে মাধ্যমিক বিদ্যার্থীদেরও হাসি পায়না) এসব নিয়ে লিখুন, কিন্তু প্রতি সপ্তাহে এই ডজনখানেক ভারতকোষ ছাপিয়ে লোকের বদ্‌নেশা ধরিয়ে দিয়েছেন এটা কিন্তু ঠিক নয়। তারপর বিনাকারণে যখন দুহপ্তা ভারতকোষ বন্ধ করে দেন তখন এই আপিংখোরেদের কী অবস্থা হয় ভেবে দেখুন।

আপনার খুব ভাগ্য ভালো যে ইন্টারনেটের কৃপায় আপনাদের হদিশ পাওয়া যায় না, নচেৎ ব্যাপারটা খুনোখুনি পর্যন্ত গড়াতে পারতো।

কী বললেন, ছুটি কাটাতে গিয়েছিলেন? অবসরপ্রাপ্তদের আবার ছুটি কী মশায়? কোথায় গিয়েছিলেন, গ্রীস আর তুরস্ক বললেন? গ্রীসে কিছু ভাঙা মূর্তি আর থাম্বা দেখে ফুর্তিই বা কী হোলো, আর নতুন করে জানলেনই বা কী? আরে মশায় আমরা খাজুরাহো আর কোনারকের দেশের ছেলে। সেখানে যা আছে তা যুগপৎ লোকরঞ্জক আর জ্ঞানপ্রদ। হ্যাঁ, স্নায়ু উত্তেজকও বটে। তা সেই যে কবি বলিয়াছেন 'ধেয়ানের ধনে মূর্তি দিয়াছে আমাদের ভাস্কর' -- সেই আমাদের কি আর এই কটা কবন্ধ পুতুল দেখিয়ে ভোলানো যায়। আসলে পুরনো গ্রীসবাসীদের খুব একটা দোষ দেওয়া যায়না। প্রথমত সেসময়ে নানান দৈত্য, দানব আর অসুরে গ্রীসদেশ ছেয়ে ফেলেছিল। এই দেখুন না একচক্ষু সাইক্লোপস্ থেকে আরম্ভ করে মায়াবতী কির্কে, ছাগল-ঘোড়া-মানুষের সৃষ্টিছাড়া মিশ্রণের সেটয়ার এমনি আরো কতো কী। গ্রীকদের পোয়াটাক সময় যেতো এদের তাড়া খেয়ে আর বাকীর পোয়াটাক এদের তাড়া করে। তারপর গ্রীক দেবতাদের ব্যবহার তো আর কহতব্য নয়, যেমন কামজর্জরিত তেমনি কোপনস্বভাব। বাড়ীতে সুন্দরী মেয়ে বা স্ত্রী থাকলে তো আর রক্ষা নেই । এই গ্রীক দেবরাজ জিউসের কথাই ধরুন। গৃহিণী অতিশয় সন্দেহপরায়ণা ছিলেন, কর্তার পদস্খলনের আভাস পেলে ঝাঁটা দিয়ে ভূত তাড়াতেন বলে শোনা গেছে, কিন্তু এতৎসত্ত্বেও স্বর্গ এবং মর্ত্যবাসিনী, সবতাতেই কর্তার কৃপাদৃষ্টি রোধ করতে পারেননি। প্রয়োজন হলে জিউস ষাঁড়, এমনকী রাজহাঁসের ছদ্মবেশ নিতেও দ্বিধা করতেন না। ঠাকুরের লীলাখেলা, বুঝলেন না। আর পান থেকে চূণ খসলো কি না খসলো, শাপ দিয়ে গ্রীকদের চিরকালের ব্যবস্থা করে রাখতেন। এসবের পরেও ওভারটাইমে গ্রীকদের সক্রেটিস, পিথাগোরাস, ইত্যাদি ইত্যাদি বিবিধ পণ্ডিতদের কাছে জ্ঞানলাভ করতে হোতো, সুন্দরীদের উদ্ধারার্থে সাতসাগর পাড়ি দিয়ে লড়াই করতে হোতো, এমনিতর আরো কতো কী। এইরকম নানা অপ্রয়োজনীয় ব্যাপারে ব্যস্ত থাকতেন বলে যদিও কোনোমতে কাপড়চোপড় বয়নবিদ্যা মোটামুটি আয়ত্ত করেছিলেন, সূচীকর্মটা মোটেই কব্জা করতে পারেননি। তার সাক্ষ্য দেখুন তাঁদের রেখে যাওয়া ছবি বা মূর্তিতে -- যেখান থেকে প্রমাণ হয় যে ওঁরা সাধারণত বিছানার চাদর গায়ে জড়িয়ে ঘুরে বেড়াতেন। উত্তেজক কিছু দেখলে বা শ্রমসাধ্য কিছু করতে হলেই দিগ্‌বসন বা বসনা।

অবশ্য সেদিক দিয়ে দেখলে আমরাও কম যাই না। এই প্রাতঃস্মরণীয়া কুন্তীদেবীর কথাই ধরুন। সূর্য, ইন্দ্র, পবন তো বটেই এমনকি শেষ পর্যন্ত ধর্মঠাকুরও বাদ গেলেন না। ধর্মাচরণের এক আশাতীত পুরস্কার বলতে পারেন।এদিকে দেখুন ইন্দ্র সহস্রাক্ষ হয়ে বসে রয়েছেন, শেষ পর্যন্ত তাঁর পুজোই উঠে গেল। মনসা আছেন, ওলাইচণ্ডী আছেন, এ হিসেবের তো অন্ত নেই। আমাদের গোদের ওপর বিষফোড়া আরেকটি হোলো যে আমাদের কয়েক কোটি দেবতা ছাড়াও কিল মারবার গোঁসাই হিসেবে কয়েক লাখ মুনিঋষি ছিলেন, তাঁদের কীর্তিকর্মের ওপর ভিত্তি করে বলিউডের ছবি হয়, তবেই বুঝুন। তবে মোদ্দা কথা হোলো এই যে গ্রীকদের দেখে আমাদের শিক্ষা হয়েছিল, তাই মূর্তি-টুর্তি গড়ার কাজ আমরা দ্বাপরযুগ পার করে সেই কলি যুগে এসে শুরু করলাম। তাই এতো ভালো অবস্থায় এখনো দেখা যাচ্ছে।

গ্রীকদের স্থাপত্য দেখে চমৎকৃত হবার তেমন কিছু নেই, কেননা এই গ্রীসই ইউক্লিডের জন্ম দিয়েছে, পিথাগোরাসকে দিয়ে সাঙ্ঘাতিক জ্যামিতিক সত্য আবিষ্কার করিয়েছে, এ্যারিস্টোটল নন্দনতত্ত্ব লিখেছেন, আর্কিমিডিস পদার্থবিদ্যা চালু করেছেন। কাজেই তাদের পক্ষে ঐ বিশাল বিশাল পাথর গাদাগাদি করে মন্দির তৈরী করাটা খুব আশ্চর্যের নয়। আর গ্রীকদের তো সুন্দর বলে নামই আছে। আমার এক গ্রীক বন্ধু বললে দেখো, আমার স্ত্রী বলে বিয়ের আগে তুমি ছিলে গ্রীক গড, বিয়ের পরদিন থেকেই হয়েছো গডড্যাম গ্রীক। তাতে অবশ্য আশ্চর্য হবার কিছু নেই, মেয়েরা সবদেশেই অমনিতরো, কিন্তু যেটা আশ্চর্যের ব্যাপার সেটা হোলো গ্রীকরা স্থাপত্যে খিলেন, অর্থাৎ আর্চ, ব্যবহার করেনি কেন? যদিও বইতে দেখছি পয়ঃপ্রণালীতে এর ব্যবহার দেখা গেছে। ফলং স্থাপত্যতে থামের এতো প্রাচুর্য, বেঁটে থাম, মোটা থাম, সরু থাম, বহু থাম সবরকমের থামই আছে, সবারই মাথায় সেই চ্যাপটা খিলেন, সেগুলো খুব পোক্ত নয়। বলতে পারেন যে তখনো বাঘ-সিংগির কাছে খৃস্টানদের বলি দেবার প্রথা চালু হয়নি কাজেই বিরাট বড়ো অ্যাম্ফিথিয়েটারেরও দরকার ছিলো না, আর্চেরও দরকার ছিলো না। যদি খেয়াল করে থাকেন তবে দেখবেন গ্রীকদের এই সাধারণ মঞ্চগুলো বেশ সাদাসিধে সিঁড়ি ছাড়া আর কিছু নয়, একটু গোলাকৃতি এই মাত্র।

গ্রীকরা শুনেছি সাধারণত নির্বিরোধী স্বভাবের লোক। আমি সামান্য যা নমুনা দেখলাম তাতে তাই মনে হোলো। অবশ্য আমার দেখা হচ্ছে ল্যাজে ফুলঝুরি বাঁধা পর্যটকের দৃষ্টিতে দেখা, তাতে ঐ সাজানো গোছানো পর্যটক-ভোলানো জায়গা ছাড়া আর কোথাও যাবার সুযোগই নেই। অন্যেরা নাকি গ্রীকদের কাঁধে বন্দুক রেখে দেগে যায়; সেটা গ্রীক ইতিহাসে চোখ বোলালেই জানা যায়। গ্রীসের এক-তৃতীয়াংশ লোক থাকে অ্যাথেন্স শহরে বা তার আশে পাশে। সে শহরে ভীড় আছে, বায়ুদূষণ আছে কিন্তু নোংরা -- অর্থাৎ গোময়, ডাবের খোলা, পানের পিক -- নেই, অন্তত আমরা যেখানে ছিলাম তার কাছাকাছি। হোটেলের বারান্দায় বা দরজার সামনে দাঁড়ালে জনপ্রবাহ, জীবনপ্রবাহ যে কী তার সুন্দর হদিশ পাওয়া যায়। নিউ ইয়র্কের মতো, রাস্তায় গাড়ী নির্বিবাদে ডবল, তেমন তেমন হলে ট্রিপল পার্ক করে দাঁড়িয়ে আছে, যেখানে সেখানে রাস্তা পার হলে যে গাড়ী চাপা দেবেনা তার কোনো নিশ্চয়তা নেই। ভ্রমণ-তথ্যের বইতে সতর্ক করে দিয়েছে যে গ্রীক পুরুষদের পুং-হর্মোনটা একটু বল্লাছাড়া, তা ভাগ্য ভালো যে আমাদের দলটির ওপর তাঁদের নেকনজর পড়েনি। থাক, তার আর কারণ খুঁজতে যেতে হবে না। ঐ বইয়েরই ভ্রমণ-তথ্য হোলো 'কুখ্যাত অ্যাক্রোপোলিস-পার্থেনন', সে কথাটা ভ্রমণ-সত্যও বটে। তারপর গ্রীক দ্বীপপুঞ্জ, খুদে খুদে থেকে প্রমাণ-সাইজ, সব রৌদ্রস্নাত, সমুদ্র-উপকূলের বাড়ী চোখধাঁধানো উজ্জ্বল সাদা রং, জানলা নীল -- আর সাগর তো প্রেমেন্দ্র মিত্রের ভাষায় 'ফিকে, গাঢ়, হরেকরকম, কমবেশী নীল'। এই সব ছোট ছোট দ্বীপের মানুষরা কী খায় তা কে জানে -- পাথুরে জমিতে খোঁচা খোঁচা ঝোপ, মধ্যে মধ্যে কিছু জলপাই গাছ। সান্তোরিনির মতো ছোট দ্বীপে রোডোস থেকে জল আমদানী করতে হয় জাহাজে করে বলে শুনলাম। সুখের কথা যে দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের পর তিনচার দশক গ্রীস বেশ গুছিয়ে নিয়েছে জলপাই, মদ, জাহাজী ব্যবসা আর পর্যটন রপ্তানি করে। তাই গ্রীসে দারিদ্র্য থাকলেও তা খুব প্রকট নয় বলে শুনেছি। বহুদিন আগে নিকোস কাজান্তজাকিস বই লিখেছিলেন 'জরবা, দি গ্রীক', মুভি হয়েছিলো, ব্রডওয়ে শোও হয়েছিলো। সামান্য কয়েকদিন গ্রীসে থেকে আমার মনে

হোলো সত্যিকারের গ্রীক চরিত্র কাজান্তজাকিস ধরতে পেরেছেন তাঁর এই বইতে। কাজান্তজাকিসের উচিত ছিলো নোবেল প্রাইজ পাওয়া, কিন্তু সে বছর তিনি এক ভোটে হেরে যান আলবেয়ার কামুর কাছে। জরবা ছবির টুকিটাকি আজও গ্রীসের বাজার আলো করে রেখেছে, গ্রীকরা মনে করে জরবা চরিত্রেই তাদের ছবি ফুটেছে ভালো। বা পশ্চিমী পর্যটকদের উচিত ভাঁওতাও হতে পারে। যাকগে, একটু অপ্রাসঙ্গিক হলেও বলি, সময় পেলে কাজান্তজাকিসের লেখা 'দি লাস্ট টেম্‌পটেশন অফ ক্রাইস্ট' পড়ে দেখবেন, চিত্ত চমকিত হবে।

রোডোস গিয়ে এক গ্রীক ট্যাক্সিড্রাইভার নিকোলাসের-- আমাদের দেশের কুট্টি আর কী -- সঙ্গে পরিচয় হোলো, সে নাকি সাতপুরুষে রোডোসের বাসিন্দা। বছরদশেকের মতো ডেট্রয়েটে ছিলো, জেনারেল মোটর্সে চাকরী করে কিছু টাকা জমিয়ে আবার গ্রীসে ফেরৎ এসেছে। ইংরেজি বলে এবং বোঝে। আমাদের এখানকার এখনকার নেতাজি এই ভালো কাজটি করেছেন যে ওঁর নাম ঠিকমতো নিলেই বিদেশীদের সঙ্গে ভালো ভাব জমানো যায়। এখানেও তাই হোলো। বাঁধনহারা পিণ্ডদানটি হোলো গৌরচন্দ্রিকা। তারপর নিকোলাসের জীবনদর্শনের সঙ্গে পরিচয়। রোডোস তার প্রাণ, পৃথিবীর মধ্যে যদি স্বর্গ কোথাও থাকে তা এইখানে, . . . । আমরা রোডোসে প্রতি বছর এসে বাড়ী ভাড়া করে ছুটি কাটাবার অভ্যেস করবো, এই প্রতিশ্রুতি দিয়ে কথা ঘোরানো গেলো অন্যদিকে। অবশ্যই নিকোলাস থাকতে আমাদের কোনো অসুবিধেতেই পড়তে হবে না। ঘোরতর ইহুদি এবং ইজরায়েল বিদ্বেষী। প্যালেস্টাইন নিয়ে খুব একটা চিন্তিত নয়, ওর বিশ্বাস যে ওর জীবদ্দশাতেই বর্তমান প্যালেস্টাইন বলে যা পরিচিত, তার থেকে এখনকার পঁচিশ লাখ বাসিন্দা লোপ পেয়ে যাবে -- মার খেয়ে, আত্মহত্যা করে, নিজেদের মধ্যে খেয়োখেয়ি করে (সত্যদ্রষ্টা বোধহয়) আর না খেতে পেয়ে । সম্প্রতি জিমি কার্টারের একটা বই পড়েছি প্যালেস্টাইনের ওপর; তার সঙ্গে দেখি নিকোলাসের বেশ মতের মিল আছে। ইস্তানবুলের তুর্কীদের একেবারেই দেখতে পারেনা, অহঙ্কারী, অসভ্য এবং অর্থপিশাচ। এদিকে কিন্তু কুসাদাসি অঞ্চলের তুর্কীদের প্রতি ভারী সহানুভূতিশীল -- আহা রে বেচারিরা বড়ো গরীব। ইরাকে আমেরিকান সৈন্য বা ইরাকী জনসাধারণের মৃত্যুতে বিচলিত নয় মোটেই -- ধেড়েরা যদি নিজেদের ভালোমন্দ না বোঝে তাদের অমনই হওয়া উচিত। কিন্তু এদের সঙ্গে সঙ্গে যে অনেক শিশু মারা যাচ্ছে, এটা কিছুতেই মেনে নিতে পারেনা। জানিনা আমাদের দেশে, ধরুন কোলকাতায়, ট্যাক্সিচালক কী এরকমই কিছু বলতো -- হয়তো । ট্যাক্সি চালানো আর দর্শনচর্চার মধ্যে একটা সহজ যোগসূত্র আছে, দেশকাল নির্বিশেষে, এটা মানেন তো। ভুয়োদর্শন বলছেন? তাতো বলবেনই, আপনারা বিশ্ব নিন্দুক।

জাহাজে একটি তরুণীকে দেখেছিলেন যে আপন মনে ঘুরে বেড়ায় আর মধ্যে মধ্যেই মাথার একরাশ চুল ঝাঁকিয়ে খিল্‌খিল করে হেসে ওঠে? দেখে মনে হোলো পাগলী হবে নিশ্চয়, কিন্তু সঙ্গে কেউ নেই কেন? পরে খাবার টেবিলে বিশ্বস্তসূত্রে জানা গেলো মেয়েটির চার বছর বয়সে কী এক দুরারোগ্য ব্যাধি হয়, তাতে সে অচেতন হয়ে, অর্থাৎ কোমায় ছিলো প্রায় পঁচিশ বছর। মাত্র বছরখানেক হোলো সে হঠাৎ জেগে উঠেছে, এবং তার তরুণী দেহে শিশু মনটিকে নিয়ে পৃথিবীর মোকাবেলা করছে। আত্মীয়স্বজন জাহাজে নিয়ে এসেছেন, বোধহয় বড়ো হওয়াটাকে আর একটু ত্বরান্বিত

করার জন্য। তার কিছু অসুবিধে তাঁরা হাড়ে হাড়ে মালুম পাচ্ছেন। মেয়েটি অসঙ্কোচে লোকদের কাছে গিয়ে তাদের বয়েস জিজ্ঞাসা করে, জানতে চায় তারা এতো মোটা কেন, ইত্যাদি, অমৃতং বালভাষিতং। পূর্ণযৌবনার এধরণের অবিমৃশ্যকারিতায় আমাদের অস্বাচ্ছন্দ্য হতে পারে কিন্তু তার নয় -- তাকে পঁচিশ বছরের বড়ো হওয়াটাকে কয়েকদিনের মধ্যে সেরে নিতে হবে, তার সময় কই? এবার তার মাথা ঝাঁকানো কলহাস্যে মনে হোলো এতো দেখেছি আগে, আমার দেড় বছরের নাতনী তো এমন করেই হাসে -- কারণে, অকারণে, নিছকই বেঁচে থাকার আনন্দে! 'দুহাত দিয়ে বিশ্বেরে ছুঁই শিশুর মতো হেসে'। বিদেশ ভ্রমণের সম্পূর্ণ উপরি লাভ।

শিকড় যতো উপড়ে আসছে, ধ্বংসাবশেষ আর নিসর্গ দেখার আঠা ততোই কমে আসছে বুঝতে পারছি। তার থেকে এই নিকোলাসের দেখা পাওয়া, এই যে আপনাদের সৎসঙ্গে কিছুদিন কাটাবার সুযোগ পাওয়া -- এসব আস্তে আস্তে অমূল্য বোধ হতে আরম্ভ করেছে আমার কাছে। এই দেখুন কেবল শাজাহানের মতো নগণ্য দুচারজন ছাড়া ইতিহাসে যাঁরা অমর হয়ে আছেন তাঁরা সবাই নাম করেছেন হয় বহু মানুষকে জবাই করে অথবা ধর্মগুরুদের মতো বহু লোককে বোকা বানিয়ে। ধ্বংসাবশেষ তৈরী করে নয়। দেখুন যখন মরে যাবো তখন কোনো ধ্বংসাবশেষ আমার জন্য চোখের জল ফেলবে না, কোনো নিসর্গ উদাস হবেনা আমার জন্য। কিন্তু এই নিকোলাস যখন বাড়ী গিয়ে গিন্নিকে বলবে, আজ এক বাঙালী ছাগলের গলা কাটার সুযোগ পেয়েও কাটতে পারলাম না, বেচারী বড়োই গোবেচারা, তখন আমার আয়ু দুমিনিট যাবে বেড়ে। বা মরার পরে যখন আপনারা শোকসভা করে বলবেন ছোকরা অত্যন্ত ফাজিল হতে পারে, কিন্তু শ্যেনচক্ষু ছিলো মানতেই হবে; এই দেখ গ্রীস বেড়াতে এসে গ্রীক আর রোমানদের বংশাণুঘটিত অর্থাৎ জেনেটিক প্রভেদটা কেমন চট করে আবিষ্কার করে ফেললো। তখনও আমি আপনাদের এই ভালোবাসার মধ্যে কয়েক মিনিট বেঁচে উঠবো। অন্তত যতক্ষণ আপনারা আমার আবিষ্কারের বিষয়টা আবিষ্কার না করছেন।

তাছাড়া এই গ্রীক মূর্তি-টুর্তি দেখে বয়স ও বাঁধভাঙা ই-মেলের কৃপায় ক্রমবর্ধমান হীনমন্যতাবোধ অন্তত আংশিক রোধ করার প্রতিষেধক পাওয়া গেলো, সেটিই বা কম কী, বলুন?

আজ চলি। ভালো থাকবেন স্যার। এই বয়সে যা রয়সয় তার বেশী যেন করতে যাবেন না।

বিনীত, প্রণবকুমার দাস